পঞ্চভূত

পঞ্চভূত

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ শাখায় একটি বিশিষ্ট নাম—'পঞ্চভূত'। প্রবন্ধ রচনার লেখনী যে আত্মখণ্ডন, স্বতোবিরোধ ও অসামঞ্জস্য এড়িয়ে চলতে চায়, পাঞ্চভৌতিক সভার সৃষ্টি করে কবি তা না এড়িয়ে রহস্যময় জীবনের গতি ও চিন্তাজগতের সমস্যাগুলির বিশ্লেষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

যে পঞ্চভূত থেকে সব কিছুর সৃষ্টি সেই পঞ্চ ভূতকে কবি এই গ্রন্থটিতে আশ্রয় দিয়েছেন এবং নিজেই সেই পাঁচটি ভূতের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তবে পাঁচটি চরিত্রের উক্ত মনোবৃত্তির স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য যথাযথ বজায় রেখেছেন।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—পঞ্চভূতের এই প্রচলিত নাম রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনে ঈষৎ বদল করে তাদের মধ্যে মানবিক গুণের প্রয়োগ করেছেন। এদের মধ্যে ক্ষিতি ও ব্যোম-কে প্রকৃত নামে স্থিত রেখে অপ্‌কে স্রোতস্বিনী তেজকে দীপ্তি ও মরুৎকে সমীর নামে অভিহিত করেছেন। এই বিশিষ্ট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রগুলির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ব্যক্তি চরিত্রের আভাসও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের পরিবারের কয়েকজন এই পাঁচটি চরিত্রের মধ্যে মিশে আছেন। স্রোতাস্বিনী (অপ্) চরিত্রে ইন্দিরা দেবী, দীপ্তি (তেজ) চরিত্রে কাদম্বরী ও সরলাদেবী সমীর (মরুৎ) চরিত্রে লোকেন পালিত ও প্রমথ নাথ চৌধুরী ও ব্যোম চরিত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথের ছায়াপাত ঘটেছে। ক্ষিতি চরিত্রের উৎসকে ছিলেন স্পষ্ট করে বলা যায় না। পঞ্চভূতকে মানবিক পরিচিতি দিয়ে তাদের আসরে তত্ত্বগত আলাপ আলোচনাকে সরস ও বুদ্ধিদীপ্ত করে তুলেছেন। পঞ্চভূতে পাঁচটি ভূতের সমাবেশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন—

> "জীবনের গতি স্বভাবতই রহস্যময়। তাহার মধ্যে অনেক আত্মখণ্ডন। অনেক স্বতোবিরোধ, অনেক পূর্বাপরের অসামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু লেখনী স্বভাবতই একটা সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে চাহে। সে স্বতোবিরোধের মীমাংসা করিয়া, সমস্ত অসামঞ্জস্য সমান করিয়া কেবল মোটামুটি রেখা টানিতে পারে।"

চিন্তাশীল ব্যক্তির মনোলোকে যে চিত্র বৈচিত্র্যের নাট্যাভিনয় চলেছে, তাতে সাহিত্যে প্রকাশ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ মনোলোকের চিন্ময় পাত্রপাত্রীদের পঞ্চভূতের রূপদান করেছেন। তাতে ভিন্ন ভিন্ন জীবনের রসানুভূতি, অভিজ্ঞতা, প্রাণের উষ্ণতা ও উদ্দীপনা, তত্ত্বের মনোবিজ্ঞানগত বিশ্লেষণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অভিনব বৈচিত্র্য ও মাধুর্যের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে যে কবিত্ব, আলঙ্কারিকতা, নাটকীয়তা কৌতুক রসিকতা প্রবন্ধের যুক্তি পরম্পরার ক্রমভঙ্গ ঘটিয়ে ত্রুটির কারণ হ'ত, এ পদ্ধতিতে সেগুলো উপযুক্ত ও যথাযথ হয়েছে। পঞ্চভূতের পাঁচটি চরিত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব বোধ ও দর্শনে মনোমত করে সৃষ্টি করেছেন।

Scanned with CamScanner

ক্ষিতি-কে জীবন প্রসূ সরস ক্ষিতির প্রতীক রূপেই দেখানো হয়েছে। তিনি জড়বাদী, প্রত্যক্ষবাদী, স্থূল সত্যের পক্ষপাতী; সত্যকে ইনি ব্যবহারিক জগতে নিয়োগ করতে চান। তাঁর মতে সভ্যতার অর্থ—অপ্রয়োজনীয়কে বর্জন ও উন্নতির অর্থ—আবশ্যকের সঞ্চয়।

জল যাতে জীবনময় হ'য়ে উঠেছে সেই নদীর প্রতীক রূপে স্রোতস্বিনী (অপ্) সৃষ্ট হয়েছে। কণ্ঠস্বরে, লীলায়িত ভঙ্গিতে, চরিত্রের তারল্যে ইনি যেন স্রোতস্বিনীর নারীরূপ আবার মধুর প্রকৃতি নারীরও প্রতিনিধি। ইনি ভাবপ্রবণ, চঞ্চলা, তরলা, কোমলহৃদয়া, সুন্দরের পূজারিণী। পঞ্চভূতের 'মনুষ্য' প্রবন্ধটিতে এর চারিত্র বৈশিষ্ট্য সমধিক প্রকাশিত।

'তেজ'-কে দীপ্তি নামের মধ্য দিয়ে নারীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। স্রোতস্বিনীর মধ্যে যেমন রসের প্রাবল্য, এর মধ্যে তেজস্বিনী সত্তারপ্রখর বোধশক্তির প্রকাশ। স্রোতস্বিনীর মধ্যে যুক্তি প্রাবাল্যর চেয়ে রসের তারল্য বেশী। অনাবশ্যককেও স্রোতস্বিনী ভালোবাসেন। দীপ্তি কিন্তু যুক্তি দিয়ে সব কিছুকে প্রমাণ করতে চায়। তার বিশ্বাস যথাযথ দৃষ্টিতে না দেখেই পুরুষ নারীর প্রতি অবিচার করে। ব্যবহারিক সার্থকতা ও মাধুর্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করেছে। Kant ও Hegel-এর দার্শনিক মতের সঙ্গে দীপ্তির মতের মিল আছে। 'নরনারী' প্রবন্ধটিতে দীপ্তির চরিত্র বৈশিষ্ট্যের বিকাশ হয়েছে।

'মরুৎ'-কে রবীন্দ্রনাথ সমীর নামের মধ্যে প্রতীকিত করেছেন। ইনি কল্যাণবাদী।

মানুষের সঙ্গে জড়ের সংসর্গে যে বৈজ্ঞানিক কল্যাণের সৃষ্টি হয়, ক্ষিতি তাকেই একমাত্র কল্যাণ বলে মনে করেন আত্মার কথা তিনি ভাবেন না। সমীর কিন্তু আত্মার কল্যাণকেই সবচেয়ে বড় কল্যাণ মনে করে। তাই মানুষের সঙ্গে মানুষের সংসর্গে যে কল্যাণ, সেই কল্যাণই তার মতে পরম শ্রেয়। দীপ্তি ও স্রোতস্বিনী সত্যের সুন্দর রূপের উপাসিকা, সমীর সত্যের শিবরূপের।

জড়বাদের বিরুদ্ধে দু'টি তন্ত্র আছে। একটি সৌন্দর্য তন্ত্র বা aesthetic school আর একটি জ্ঞানতন্ত্র বা spiritual school। স্রোতস্বিনী ও দীপ্তি সৌন্দর্য তন্ত্রের রসাত্মক ও রূপাত্মক দিকটিকে অনুসরণ করেন। সমীর কিন্তু spiritual school-এর অনুসারী, ভাবতান্ত্রিক। তার কল্যাণের সঙ্গে সুন্দর যুক্ত বলে সে সৌন্দর্যেরও উপাসক। তবে তার ভাব বা জ্ঞানতন্ত্রের কারণেই সমস্ত কিছু আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নতুন করে গঠন করেন। সমস্ত বিশ্বকেই সমীর প্রেম, রস ও কবিত্ব দিয়ে উপভোগ্য করে তোলে। সমীর optimist বা আশাবাদী।

পঞ্চভূতের পঞ্চম ভূত 'ব্যোম' ক্ষিতির জড়বাদী মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। আত্মাকে কেন্দ্র করে সে বিশ্ববিচার করে সে অধ্যাত্মবাদী। তার মতে এই জড় জগৎ—আত্মার মূর্তি। এই কারণে ব্যোম ভারতের প্রাচীন সভ্যতার পক্ষপাতী। ব্যোম কখনো mystic, কখনা egoist, কখনো cynic, কখনো pessimist—কিন্তু সব সময়ই অধ্যাত্মবাদী। জড় জগৎ তার কাছে গ্রাহ্য নয়। তার মতে সৌন্দর্য আত্মারই সৃষ্টি। সাংসারিক কল্যাণকে জীবের চরম কল্যাণ বলে ব্যোম মনে করেনা, প্রেম তার মতে আত্মারই পাতানো একটা সম্বন্ধ। জ্ঞানযোগের পক্ষপাতী হয়েও ব্যোম স্বীকার করে কর্মযোগ ছাড়া চিত্তশুদ্ধি হয় না।

—এই পাঁচটি চরিত্রের ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়া বজায় রেখেছেন। চরিত্রগুলির বৈষম্য যতই থাকুক, সাম্যও যথেষ্ট আছে। আর সাম্য আছে বলেই

Scanned with CamScanner

পাঞ্চভৌতিক সভার সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। এই সভা যেন পারিবারিক গোষ্ঠীর অবসর সভা যেখানে তারা পরস্পর বন্ধু ভাবে আলাপ আলোচনা করে আনন্দ চক্র গড়ে তুলতে পেরেছে। একই সংস্কার ও শিক্ষাধারায় প্রভাবিত পাঁচজনের মধ্যে সখ্যতা আছে। পরস্পরের দ্বারা প্রভাবান্বিত ও অনুরঞ্জিত একই মনোভাবগুলি পাঁচটি ভূতের মূর্তি ধরেছে।

শুধু তাই নয় কবি এই পঞ্চভূতকে মতের বাহক-বাহিকাই করেন নি, মানবিকতা আরোপ করে প্রজ্ঞাময় চরিত্রগুলির অন্তরালে এক একখানি হৃদয়ও সৃষ্টি করেছেন এবং পরস্পরের হৃদয়ের সংযোগও দেখিয়েছেন। এজন্যই পঞ্চভূতে গঠিত মানুষের দৈহিকতাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন সত্তার মানবিক নামকরণ করেছেন। সর্বোপরি পঞ্চভূতের পরে ষষ্ঠ ভূত হলেন আত্মা—আত্মন্ বা কবি স্বয়ং।

পাঁচটি বিভিন্ন প্রকৃতির আত্মজের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ সত্যানুসন্ধানের ইঙ্গিত দান করেছেন। এতে অভ্রান্ত ভাবে কোনো চিন্তার মূল্য নির্ণীত না হলেও বিশ্লেষণের আনন্দ পরম লাভজনক। সত্যের আবিষ্কার বা তত্ত্বের চূড়ান্ত মীমাংসা না হলেও সত্যের আনন্দলাভই বড় কথা। এতে সত্যের প্রকাশের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য লাভ ঘটে।

পাঁচটি চরিত্রের আলাপ আলোচনায় কোনো তর্কের চরম মীমাংসা না হলেও সাহিত্যের মাধুর্য আস্বাদ করতে গিয়ে পাঠক পঞ্চভূতের আলোচনায় বহু সত্যের আনন্দময় আভাস লাভ করেছেন।

ডায়ারি

'পঞ্চভূত' ১২৯৯ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হতে থাকে 'সাধনা' পত্রিকায়—তখন এর নাম ছিল 'পঞ্চভূতের ডায়ারি'। কিন্তু গ্রন্থকারে প্রকাশের সময় এর 'ডায়ারি' অংশ বাদ দিয়ে কেবল 'পঞ্চভূত' নামেই এটি পরিচিত হয়। পরিচিত ও প্রচলিত ডায়ারি থেকে যে বইটি স্বতন্ত্র জাতের তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ নিজেই এর আরম্ভে দিয়েছেন—

> "পাঠকেরা যদি 'ডায়ারি' শুনিয়া মনে করেন ইহার মধ্যে লেখকের অনেক আত্মকথা আছে, তবে তাঁহারা ভুল বুঝিবেন।"

এই প্রবন্ধ গ্রন্থের আঙ্গিক নিয়ে প্রথমাবধি নানা মত প্রচলিত। এই গ্রন্থের 'পরিচয়' প্রবন্ধে ভূতনাথবাবু বলেছেন—

'ডায়ারি একটা কৃত্রিম জীবন'। সেই সঙ্গে একথাও বলেছেন যে যখনি ডায়ারি রচিত হয় তখনি সে আমাদের প্রকৃত জীবনের ওপর অনেকটাই আধিপত্য বিস্তার করে। আসলে মানুষ যখন নিজে ডায়ারি লেখে তখন নিজেকে একটু ভালোভাবে প্রতিভাত করার জন্য নিজে আসলে যেমন তার থেকে একটু স্বতন্ত্র জীবনী রচনা করে।

'ডায়ারি প্রসঙ্গের সূত্রপাত ঘটেছে দীপ্তির উক্তিতে; সে ভূতনাথবাবুকে বলেছে—"তুমি তোমার ডায়ারি রাখনা কেন?" তার উত্তরেই ভূতনাথবাবু ডায়ারি সম্পর্কে উরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেছেন যে মানুষের জীবন এক অনির্দেশ্য নিয়মে এগিয়ে চলে, স্রষ্টা যেভাবে জীবনধারা চালিত করেন সেই ভাবে। কিন্তু মানুষ যখন ডায়ারি বা আত্মজীবনীতে সে জীবনকে ধরে রাখার চেষ্টা করে তাতে একটা দ্বিতীয় জীবনধারার সৃষ্টি হয়।

Scanned with CamScanner

ডায়ারি লেখার স্বপক্ষে দীপ্তির যুক্তি হলো—আমাদের মনে প্রতিদিন তাৎক্ষণিকভাবে কত ভাবের উদয় হয় তাদের সঙ্গে সঙ্গে লিখে না ফেলতে পারলে তা হারিয়ে যেতে পারে—সুতরাং মনের তাৎক্ষণিক অনুভূতিকে সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা উচিত।

আবার স্রোতস্বিনী অন্য একটি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছে যে মনের তাৎক্ষণিক উপলব্ধিকে তখন লিখিত রূপ দেওয়া ঠিক নয়, কারণ তাতে অনেক সময়ই ক্ষণিক আবেগ ও উত্তেজনার প্রকাশ ঘটতে পারে। নিজের 'আমি'-কে ঠিকমত তুলে ধরতে গেলে কিছুদিন অপেক্ষা করাই বাঞ্ছনীয়। তাতে যা অপরিমিত, যা অতিরঞ্জিত যা উত্তেজনাপ্রসূত তা কমে গিয়ে আতিশয্য বা বাড়াবাড়ি বর্জিত হয়ে সঠিক অনুভবটুকুই ধরা পড়বে।

এভাবেই 'পরিচয়' প্রবন্ধর মধ্যে পাঞ্চভৌতিক সভার সদস্যদের ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য ধরা পড়েছে। সবার মত আলোচনা করে রবীন্দ্র মতবাদের যে সারটুকু ধরা পড়ে তা হলো এই যে প্রাতহিক দিনলিপি রাখার কিছু বিপদ আছে। তবে নিজের ধারণাকে নানা দিক থেকে আলোচনা করে তবেই রচনায় স্থান দিতে হবে—তাহলে তার সার্থকতা থাকে। দিনলিপিতে মানুষটিকে সঠিকভাবে প্রকাশ করাই 'ডায়ারি'র কাজ। প্রতিদিনের ঘটনা নথিবদ্ধ করে রাখতে গেলে আবর্জনার ভীড়ে আসল মানুষটি হারিয়ে যাবে।

তবে এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে আমাদেরও কিছু বলার আছে। আমরা একজন মানুষকে কিভাবে জানতে চাই—পরিবর্তন, পরিবর্জন, পরিবর্ধনের মাধ্যকে পরিশীলিত রূপে, না গোটা মানুষটিকে? মানবিক দুর্বলতাই তো মানুষের পরিচয়। একজন কর্তব্যনিষ্ঠ সংযত মানুষও একসময় হয়তো আবেগপ্রবণ ছিলেন— সেই মুহূর্তটাও তো সত্য। সেটাও তো তাঁর পরিচয়। সেই ক্ষণটুকুর মূল্যও কম নয়। ডায়ারি যদি সেই পরিচয়কে অবিকৃত ধরে রাখে তাতেই তার সততা। একথা রবীন্দ্রনাথও বুঝেছিলেন বলেই রচনার শেষে সমীরের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—"এখন স্থির করিতেছি আমি ডায়ারি লিখিব"; ভূতনাথবাবু বলেছেন "আমিও প্রস্তুত আছি।"

পঞ্চভূতের রচনাগুলি আসলে ক্ষিতি, ব্যোম, সমীর, দীপ্তি, স্রোতস্বিনী ও ভূতনাথবাবু—এই ছ'জনের যৌথ দিনলিপি ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রচলিত পদ্ধতির রোজ নামচা বা দিনলিপি বা আত্মজীবনী না হলেও পঞ্চভূতের নিবন্ধগুলিকে ডায়ারিধর্মী বলা সঙ্গত। প্রতিটি সদস্য তাদের মতামতকে এখানে প্রকাশ করেছেন। কেউ তাৎক্ষণিক আবেগ ও ক্ষোভকে প্রকাশ করেছেন, কেউ বা নিজের ধারণাকে সংযত ও সংহত করে লিপিবদ্ধ করেছেন। পারস্পরিক বাদ প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে রচনাগুলি সরল ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিটি সদস্যর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত এই রচনাগুলি একাধারে দিনলিপি ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সৌরভ নিয়ে সাহিত্যের সীমানাকে বিস্তৃত করেছে।

'পঞ্চভূতের' উৎস হিসেবে আমরা ঠাকুরবাড়ির 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি' বইটিতে ধরতে পারি। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—ঠাকুরবাড়িতে চিরদিন সাহিত্যিকদের মজলিশ বসিত। এই ধারা বরাবর চলিয়া আসিতেছিল। সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে একটি সাহিত্যচক্র প্রায়ই বসিত। "পারিবারিক স্মৃতিলিপি" নামে একখানি হাতে লেখা খাতা

Scanned with CamScanner

থেকে জানা যায় যে বাড়ির লোকেরা ও বন্ধুরা ঐ খাতায় নানা বিষয়ে নিজের মনের ভাব লিখে রাখতেন। ওর মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, লোকেন পালিত, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতির বিচিত্র মন্তব্য আছে। কোথাও কোথাও একটা বিষয় নিয়ে পাঁচজনের মত পাওয়া যায়। 'পঞ্চভূতে'র কয়েকটি রচনার খসড়া এই 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি' নামক হাতে লেখা খাতার মধ্যে পাওয়া যায়।

অভিনব আঙ্গিক

রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' আঙ্গিকের দিক থেকে প্রবন্ধ, কথিকা, একাঙ্কিকা ও ছোট গল্পের বিচিত্র মিশ্রণ—গদ্যরীতির দিক থেকেও সাধু ও চলিত ভাষার এক অর্ধ নারীশ্বর মূর্তি—এমনই অভিমত প্রকাশ করেছেন সমালোচক ড. রথীন্দ্রনাথ রায়।

সত্যিই এটি অভিনব গদ্য রচনা, এর জাতি-গোত্র ও সাহিত্যিক শ্রেণী নির্ণয় দুরূহ। এর বিষয়বস্তু নিয়ে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ রচনা সম্ভব, কোনো কোনো অংশ পুরোপুরি প্রবন্ধের লক্ষণাক্রান্ত। তবু এক সাধারণভাবে প্রবন্ধ বলা যাবে না, রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবেই প্রবন্ধের বন্ধন থেকে যেন মুক্তির পথ আবিষ্কার করেছেন।

এর গদ্য রচনায় প্রবন্ধের পল্লবিত বিন্যাস আছে, কিন্তু বক্তব্য সম্প্রসারণের রীতি প্রাবন্ধিকের নয়। প্রচলিত প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকই একমাত্র বক্তা থাকেন, সবটুকু বলার দায়িত্ব তাঁরই। কিন্তু পঞ্চভৌতিক বৈঠকের সদস্য ছ'জন (পঞ্চভূত ও ভূতনাথবাবু) বক্তব্যের দায়িত্ব ছ-জনেই বহন করেছেন। সম্ভবত কবি প্রবন্ধের বন্ধন শিথিল করে বক্তব্যকে আরো চিত্তাকর্ষক করার জন্যই অভিনব রীতির প্রয়োগ করেছেন।

পঞ্চভূতের রচনার সঙ্গে ছোটগল্পের সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায় তবে ছোটগল্পের স্বাদ থাকলেও এরা ছোটগল্প নয়, চরিত্রগুলিকে বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে কোথাও যুক্ত করা হয়নি। এর সদস্যরা বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করলেও নিজেদের জীবনকে কোথাও উন্মীলিত করেননি। প্রাবন্ধিক রীতি বর্জন করে বক্তব্যকে বৈচিত্র্যময় করতেই কোথাও কোথাও গল্পের টেকনিক আনা হয়েছে।

নাটক নয়, কিন্তু কোনো কোনো রচনা পড়ে মনে হতে পারে একাঙ্ক নাটক রচনা করার মতো উপাদান এতে আছে। কোথাও কোথাও নাটকীয় সম্ভবনা থাকলেও ফর্ম ও লেখকের বক্তব্য কোনোটিই নাটকীয় নয়।

এর শ্রেণী নির্ণয়ে ডায়ারির কথাও মনে আসতে পারে। 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশকালে এটি 'পঞ্চভূতের' ডায়েরি নামেই প্রকাশিত হয়েছিল। পরে 'ডায়ারি' অংশটুকু ত্যাগ করে কেবল 'পঞ্চভূত' নামেই গ্রন্থটি চিহ্নিত হয়। ডায়ারিতে দিনপঞ্জি বা রোজনামচাই সব নয়। সাহিত্যিক গুণান্বিত ডায়ারিতে লেখকের নির্জন মনের ছায়া পড়ে, খেয়াল খুশির বিচিত্র স্পন্দনে ভাবনার গভীর মর্মমূল আলোড়িত হয়ে ওঠে। তবু প্রচলিত অর্থে পঞ্চভূতকে ডায়ারি বলা যায় না ডায়ারির সবটুকু ডায়ারি লেখকের দৃষ্টির দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়ে ওঠে। অপরের প্রসঙ্গ থাকলেও তাদের চরিত্র করে তোলা হয় না। রবীন্দ্রনাথ পঞ্চভূতের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য করে তুলেছেন; তাদের প্রত্যেকের স্বাতন্ত্রও উল্লিখিত।

এই ডায়ারির লেখকও পঞ্চভূতের সঙ্গী। তিনি ভূতনাথবাবু তবে ভূতদের সঙ্গে তাঁর

Scanned with CamScanner

পার্থক্য আছে। তিনি আলোচনা করেন, কিন্তু অনেকটাই নিরপেক্ষ। তিনি সভাপতির মতো সকলের বক্তব্য উপস্থাপিত করে ব্যাখ্যা করেন।

'পঞ্চভূতে'র ষোলোটি রচনার মধ্যে একটি বিদগ্ধ মনের অভিজাতরুচি অখণ্ড রসলোকের সৃষ্টি করেছে। এজন্যে একে বিশেষ ধরণের ডায়ারি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এটি মিশ্ররীতি ও রসের অভিনব গদ্য রচনা, যা রবীন্দ্র সাহিত্যেও একক ও দোসর রহিত।

Scanned with CamScanner